Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 102 – 111
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

কমলকুমার মজুমদারের গল্পে প্রেমবৈচিত্র্য

দেবাঙ্গনা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : debangganab.987@gmail.com

Keyword
কমলকুমার মজুমদার, প্রেম, ভিন্নধারা, বৈচিত্র্য, সমকাম, নারী জীবন, একাকিত্ব, বাতসল্য-প্রেম।

Abstract
কমলকুমার মজুমাদার বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন ধারার কথাশিল্পী। তাঁর রচনায় আমরা প্রেম, মনোস্তত্ত্ব, রাজনীতি, সামাজিক বৈষম্য থেকে শুরু করে সমকাম, বিকৃত যৌনতা– সব ধরনের বিষয়েরই অবতারণা পেয়ে থাকি। তবে যদি কমলকুমারের কথাসাহিত্যে প্রেমের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব, তিনি প্রেমকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে চেয়েছেন। কখনো তা কৈশোরের প্রেম, কখনো এক সৈনিকের জীবনের প্রেমের গল্প, কখনও এক নারীর জীবনের ভালোবাসার গল্প, আবার কখনওবা তা শুধুই এক বৃদ্ধের একটি শিশুর প্রতি বাৎসল্য স্নেহের ভালোবাসার রূপধারণ –এরকম একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে কমলকুমারের গল্পে প্রেম উঠে এসেছে। তিনি সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর গল্পের চরিত্রদের স্থাপন করেছেন এবং সেইসঙ্গে চেষ্টা করেছেন তাদের জীবনে ভালোবাসার রূপটি ঠিক কীরকম হতে পারে, তাই ব্যাখ্যা করতে। তবে, কমলকুমার বরাবরই এক স্বাতন্ত্র্যের নাম। তাঁর ভাষা, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন- তাঁকে তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যকদের থেকে অনেকাংশেই স্বতন্ত্র্য করে তোলে। ফলে তাঁর গল্পগুলিতে প্রেমের প্রকাশও ভিন্ন। চরিত্রদের বাচনভঙ্গি, তাদের অনুভব অনুভূতির কথা বুঝে ওঠাও খানিক কষ্টসাপেক্ষ। তিনি গল্পগুলিতে বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাষার ব্যবহার– সবকিছুর মধ্যেই রেখেছেন চরিত্রের মনোস্তাত্ত্বিকতার প্রকাশ। মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কীভাবে একটি মানুষ তার সম্পর্কের শিকড় সন্ধান করে, কী করে নীতিবোধের উপর জয়লাভ করে প্রেমবোধ, কেমন করে দীর্ঘ একাকিত্ব মানুষের মনে প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে, এই সবকিছু নিয়েই কমলকুমারের গল্পে প্রেমের বৈচিত্র্য স্থাপিত হয়েছে।

Discussion
মানব জীবনকে কেন্দ্র করেই জন্ম নেয় সাহিত্য। পারিপার্শ্বিক সমাজ এবং সেই সমাজে বসবাসকারী মানুষকে ঘিরেই তার বিস্তৃতি। বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যে বিভিন্ন কথাসাহিত্যিক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এই মানব জীবনকে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সার্থক উপন্যাসের জনক বঙ্কিমের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এর চলন। তাঁর উপন্যাসে আমরা যেমন পেয়েছি সমাজ সংস্কৃতি, তেমনি এসেছে ঐতিহাসিকতা, দর্শন প্রভৃতি। কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে

সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল জীবনবোধ। আর এই জীবনবোধের অনুভূতিকেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকেরা। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন, বিভূতিভূষণ বা তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে সেই জীবনবোধ কিন্তু ছিল একটু ভিন্ন ধারার। ঠিক সেভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত এই জীবনবোধের গাথা রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকেরা। তবে এই জীবনবোধকে একটু ভিন্ন স্বাদের রসে জারিত করে যাঁরা উপস্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল কমলকুমার মজুমদার। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে একটু অন্যভাবে। তাঁর ভাষায়, ভাবে, চিন্তাচর্চায়, জীবনধারণের মধ্য দিয়েই তিনি বোঝাতে চাইতেন তাঁর জীবনবোধকে। তবে কমলকুমারের গল্পে যেভাবে বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিককে তিনি নির্দেশ করেছিলেন, তা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। এক নতুন ধারার গদ্য প্রকরণ তিনি উপহার দিয়েছিলেন পাঠককে,

> "কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা' 'ফৌজ-ই-বন্দুক' ইত্যাদি গল্পের গদ্য প্রকরণ বাংলা গল্প ধারাকে রীতিমত গৌরব সমুন্নতি দেয়। তিনি এই ধারার গল্পের প্রথম পথিকৃৎ।"[১]

মানবজীবন নির্মাণের এই অভিনব প্রক্রিয়াকে আরও বিচিত্র করে তুলেছিল তাঁর ভাষা,

> "ভাষাগত ব্যবহারে কমলকুমার মজুমদারের শিল্পনিষ্ঠ স্বতন্ত্র পদচারণা শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষনীয়।"[২]

তবে মূলত "অন্তেবাসী জীবনই সাহিত্যিক কমলকুমারের স্বক্ষেত্র।"[৩] আর এই জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল প্রেম। তাঁর একাধিক গল্পে প্রেম এসেছে একাধিকবার। তবে, সেই অনুভূতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন বৈচিত্র্যের মোড়কে। কখনও তা দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীর প্রেম, কখনও তা শুধুই একজন নারী বা পুরুষের অনুভূতি, কখনও সেই প্রেম পরিণত হয়েছে বাৎসল্যে আবার কখনও বা তা শুধুই মানবমনের এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা।

কমলকুমার গল্পগুলির মধ্য দিয়ে তিনি যে বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের উপস্থাপন করেছেন, তা সত্যিই স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। সেই গল্পগুলিতে যেমন উঠে এসেছে দুটি কিশোর-কিশোরীর মনে জন্ম নেওয়া প্রেমবোধ, সংসার, সন্তান ইত্যাদির প্রথম অনুভূতি, তেমনি এসেছে দূর প্রান্তরে যুদ্ধরত এক সৈনিকের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা। তিনি তাঁর গল্পগুলির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যৌনতা এবং বিকৃত যৌন চাহিদার মতো বিষয়গুলি। একইভাবে এসেছে মানবজীবনের বিশেষত নারীর জীবনে অসহায়তা, একাকিত্ব প্রভৃতি অনুষঙ্গ। নীতীশ আর গৌরীর জীবনের বাল্যপ্রেম হঠাৎই পরিণত হয়ে উঠেছিল একটি 'লালজুতো'র উপস্থিতিতে। দোকানে নিজের জন্য জুতো কিনতে গিয়ে নীতীশ দেখেছিল একজোড়া লালজুতো। কিশোর বয়স্ক নীতীশের মনে এক অন্য অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল জুতোজোড়া,

> "সহসা যেমন দুর্বার দখিন হাওয়া আসে, তেমনি এল অজানা মধুর আনন্দ, ওই কিশোর নীতীশের বুকের মধ্যে।"[৪]

একজোড়া লালজুতোর মধ্যে নীতীশ যে 'পবিত্র, কোমল, নিষ্কলুষ'[৫] দু'টি পা কল্পনা করেছিল তা যেন প্রকৃত অর্থে একটি ছেলের মনে জেগে ওঠা প্রথম পিতৃত্বের আভাস। গৌরীর সঙ্গে তার অম্ল-মধুর সম্পর্ক আদৌ প্রেম কি না, তা নীতীশ জানতো না। তবে লালজুতো পরা কাল্পনিক কোমল পা দুটির সঙ্গে যে শিশুর মুখ সে কল্পনা করে, তা অবিকল গৌরীর মতো দেখতে। এমনকি তার গায়ের রঙ পর্যন্ত গৌরীর মতন,

> "ওকে দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না, সেই শিশুর মুখ; যাকে সে দেখেছিল নিজের ভিতরে, অবিকল গৌরীর মতই ফর্সা- ওই রকম সুন্দর চঞ্চল, কাল চোখ!"[৬]

অর্থাৎ, নীতীশ এবং গৌরীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিল এক একজোড়া লালজুতো। শুধুমাত্র বাৎসল্যের অনুভূতি তাদের দু'জনের মাঝে যে সেতু নির্মাণ করলো, তার বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পকার বললেন,

> "গৌরীর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, ওই লাল জুতো পরে, নীতীশ টলমল করে চলল, আর- গৌরী চলতে শুরু করলে, নীতীশের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে।"[৭]

'মধু' গল্পে প্রেমের এক নতুন আঙ্গিককে সামনে নিয়ে এলেন কমলকুমার। এই গল্পের প্রেম শুধুই মনের মিলন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রবল শারীরিক আকর্ষণ। কলাবতীর দেহ-সৌন্দর্যের প্রতি কথকের তীব্র আকর্ষণ এই গল্পের উল্লেখযোগ্য বিষয়,

"কি তার রূপ – কালো চোখদুটী কতো ভাবে ভরা- গভীর-কৌতুকের-স্বপ্নমাখা।"[৮]

তাদের এই আকর্ষণের মাঝে বাধা ছিল অসংখ্য। সমাজ, সামাজিক স্তর, আদব-কায়দা, জীবন-যাপন– সবকিছুই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাঝে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলাবতীর মোহিনী রূপের প্রতি তার আকর্ষণ শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণ হয়েই থেকে যায় না, কথক কলাবতীর প্রতি অনুভব করেন হৃদয়ের বেদনা। যে বেদনা দীর্ঘদিনের একাকীত্ব ভঙ্গের ফলস্বরূপ। কলাবতীর হোগলা পাতার ঘর, সুবচনীয়া বা তার সমাজের কাছাকাছি এসে তিনি নিজেকে তাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা কি সত্যিই সম্ভব? শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়ে বা কলাবতীর বানানো পানের অযোগ্য চা-কে 'চমৎকার' বলেই কি কলাবতীর সমাজের অঙ্গ হয়ে ওঠা যায়?

কলাবতী, সুবচনীয়া, জীবদয়াল বা নাগেশ্বরের জীবন ঘোর বাস্তবের এক রেখাচিত্র। সেখানে আর্ট নেই। তারা জানে না আর্ট কী। জীবনকে আর্টিস্টিক করে তোলার দাবী তাই তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু কথক কলাবতীকে ভালোবেসে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে, তার জীবনযাপনে অভিভূত হয়ে জীবনকে আর্টিস্টিক করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তাই যখন কলাবতীর সঙ্গে কাটানো সময় বাবদ কিছু টাকা জীবদয়ালের হাতে দিতে হচ্ছে তখন কথকের চিত্ত ধিক্কারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। তিনি আশ্রয় চেয়েছিলেন কলাবতীর কাছে। ভর দুপুরে কথকের জীবনে 'মধু' নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল কলাবতী। যৌবনরসে ভরপুর তার শরীর, সুমিষ্ট তার কথার ভঙ্গি, তার জীবনযাপনে ভিন্নতার স্বাদ তাঁকে দিয়েছিল বহুকাঙ্ক্ষিত এক শান্তির আভাস। কিন্তু যখন সেই শান্তিকেই বিকিয়ে দিতে হচ্ছে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে, তখন আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে কথকের মন –

> "এ জীবন আমার ভাল লাগে নি- এই প্রতি মুহূর্তের জন্যে ভাবা জীবন, এর মধ্যে কোন আর্টের লেশমাত্র নেই..."[৯]

'মল্লিকা বাহার' গল্পে লেখক বিবৃত করলেন মল্লিকা নামের একটি ২২/২৩ বছর বয়সী মেয়ের ভালোবাসার কথা। আয়নায় আবক্ষ দেখতে পাওয়া মল্লিকার জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দারিদ্র্যের কথা দিয়েই গল্পে সূচনা। নিজের আবক্ষ প্রতিচ্ছবিতে সে দেখতে পায় এক "পুরুষোচিত ক্লান্তি"[১০]। আয়নায় সাক্ষাৎ নিচেই ব্র্যাকেটে থাকা প্রসাধনী সেই ক্লান্তি ঢাকতে ব্যর্থ। সদ্য চাকরি পেয়েছে সে। পরিস্থিতির পরিবর্তন তো বটেই, সেইসঙ্গে পরিবর্তিত হতে চলেছে তার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি।

> "...সে আর আইবুড়ো মেয়ে থাকবে না কখনই, চাকরে হবে। ম্যাগো চাকরে! কতটুকু মান তাকে আর কে দেবে যেহেতু সে চাকরে সেইহেতু; তা আঁচলটা যেদি দৈবাৎ কারো মুখে লাগে কতটুকু স্পন্দন জাগবে তাতে করে! হাতের খবরের কাগজটা দিয়ে সরিয়ে আবার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে লোকটি- যুবকটি। এরাই, অন্যপক্ষে তারা যারা সাগ্রহে গৃহস্থ কর্মরত মেয়ের দিকে হাপিত্তেশে চায়! এরাই অন্যহাতের ইলিশের দিকে, অন্যহাতের ফুলকপির দিকে, এমনও যে অন্যহাতের ভাঁজকৃত খবরের কাগজের দিকে চাইবে তবুও ভুলক্রমে চাকরে স্ত্রীলোকের প্রতি চাইবে না"[১১]

অর্থাৎ, মল্লিকার জীবনে নেমে আসা crisis অর্থের নয় বরং অস্তিত্বের। অর্থ উপার্জনকে কেন্দ্র করে একটি মেয়ের সংগ্রাম যখন শেষ হচ্ছে তখন সে দেখতে পায় তার জীবনে অভাব রয়ে গেছে একটি মানুষের। ভবিষ্যতের একাধিক হাতছানিকে অস্বীকার করা মল্লিকা ফিরে যেতে চায় সেই ব্রজ কিংবা আনন্দর কাছে। যাদেরকে এককালে ভালো লেগেছিল তার। কিন্তু আজও কি সেই অনুভূতিরা অক্ষত মল্লিকার হৃদয়ে? ব্রজকে এতদিন পরে দেখে মল্লিকার মনে হয়,

"অসম্ভব তীব্র এ অভিজ্ঞতা, ব্রজকেই তার ভাল লাগত, আর সে কিনা এমনধারা হয়ে গেছে..."[১২]

আবার আনন্দর বাড়িতে গিয়ে যখন সে জানতে পারে আনন্দ বিবাহিত, তখন "হাত – কামড়ানো - বেদনা তার মধ্যে যেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। ...তার আপনার প্রতি অতি ক্রোধ জন্মায়।"[১৩]

কিন্তু মল্লিকার যখন মনে হচ্ছে সে 'সবকিছু হারাচ্ছে'[১৪], ঠিক তখনই তার জীবনে এসেছে শোভনা। মল্লিকার হাত ধরে তার বাড়িতে মল্লিকাকে টেনে নিয়ে গেছে সে –

"শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সী বহুজন প্রিয়।"[১৫]

মল্লিকার এই অনুভব ভালো লেগেছিল। নিজেকে শোভনার কাছে সমর্পণ করেছিল সে। তার জীবনের পুরুষদের প্রতি যে প্রত্যাশা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তাকেই 'সদ্য ফুলের বিনীত গন্ধ'-এর মতো শোভনার কাছে ফিরে পেয়েছিল সে। যদিও, "অসভ্য অর্থও করা যেতে পারে"[১৬], তবুও মল্লিকার হাত দু'টো টেনে তাকে মালা পরিয়ে দিয়েছিল শোভনা। চুম্বনে চুম্বনে ভুলিয়ে দিয়েছিল সমস্ত না পাওয়ার শোক। যে অস্তিত্ব সংকটু কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছিল মল্লিকার অভ্যন্তর, শুধুমাত্র চাকরে মেয়ের তক্মা বয়ে বেড়ানোর যে ভয় তার মধ্যে ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছিল, সেই ভয় থেকে মল্লিকাকে মুক্তি দিয়েছিল শোভনার ভালোবাসা।

ভালোবাসার আরেক রূপ আমরা লক্ষ্য করি 'মতিলাল পাদরী' গল্পে-

> "হাঁসদোয়ার শালকাঠের ক্রুশটি বহুদূর থেকে দেখা যায়। দূর নিমড়ার টিলা থেকে, দূর সাগরভাঙার উৎরাই থেকে এবং আর আর অনেক গোয়াল, বাথান, গ্রাম থেকে দেখা যায়। এ কারণে যে, গির্জ্জাটি কষাহাঁদা জমির উচ্চে অবস্থিত।"[১৭]

আর সেই গির্জ্জার পাদরী হলেন মতিলাল। শুধুমাত্র একজন 'পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান'[১৮] হয়ে ওঠা ছাড়া যাঁর আর কোনো আশা নেই জীবনে। সেই মতিলাল পাদরীর জীবনের এক আচমকা পরিবর্তন কীভাবে তাঁর জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটায়, তাই নিয়েই গল্পের গতি বৃদ্ধি পায়।

আষাঢ়ের এক ঝড়-জলের রাত্রে তাঁর 'পবিত্র' গির্জার ঘরে প্রভু জিশুর মূর্তির তলে এক অদ্ভুত নৈসর্গিক দৃশ্যের সম্মুখীন হন তিনি।

> "বিরাট পাহাড় ধসে যাওয়ার যে গম্ভীর বজ্র ব্যাপার, প্রকান্ড প্রমত্ত সমুদ্রের সমুদ্রের দেহের ছোট নদীতে ঢল ঢুকে পড়ার যে প্রলয় অমোঘ ব্যাপার, তার থেকে ঢের ঢের বেশি এ দৃশ্য। ...সম্মুখে পবিত্রতার ছবি, নিম্নে আধো অন্ধকার বিদ্যুৎপীড়িত এই রমণী।"[১৯]

সেই রমণী অন্তঃসত্ত্বা। এক প্রবল বর্ষণমুখর রাতে প্রসববেদনায় পীড়িত হ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল গির্জায়। মতিলাল, ফুলল এবং বীণা হাঁড়ির তৎপরতায় তার সন্তান সুস্থ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু মতিলালের কাছে এই ঘটনা যেন এক অলৌকিক ঘটনার স্বরূপ -

> "বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে ধীরে বাগানে এসেই জলের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসলেন, করজোড়ে শুধু বলেছিলেন... 'প্রভু'।
>
> এ প্রার্থনা অসহায় মানুষের বোকামীর জন্য নয়। বহুদিন পর এ প্রার্থনায় প্রশ্ন ছিল, হতবাক বিমূঢ় চিত্তের প্রশ্ন। এই মেঘঘটা ত্রস্ত রাত্রে, বিদ্যুতে জনসাধারণ ভীত, পৃথিবী গুহাবৎ, ধর্ষিত ক্ষিপ্ত হারমানা বনরাজি- এ হেন সময়ে, এ দীন দুঃস্থ গিজ্জা ঘরে কে জন্মাল? খরপধার বৃষ্টিতে তাঁর দেহ বিধ্বস্ত হয়ে উঠেছিল। সহসা তিনি যেন এক বর্ণচ্ছটা দেখেছিলেন, অন্য কিছু নয়। অনন্তর তাঁর মনে হল যে, এতাবৎকাল তিনি এ প্রতীক্ষায়ই ছিলেন? আর যে, অবশেষে এই তাঁর পবিত্র পুরস্কার এল?"[২০]

সদ্য জন্মানো শিশুটি স্বয়ং প্রভু জিশু- সেই বিশ্বাসে তিনি ভামর (শিশুটির মা) এবং তার সন্তানকে শুধু প্রতিপালনই করেন না, তাদের দেন সেই সম্মান যা তিনি এতদিন দিয়ে এসেছেন তাঁর উপাস্যকে। এতদিনে তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। স্বয়ং মা মেরি রূপী ভামর তাঁর প্রাঙ্গণেই জন্ম দিয়েছে সেই যুগাবতারকে। ফলে বদন হিজড়ে বা ফুললের ভামরের চরিত্রের প্রতি আনা কোনো রকম সন্দেহজনক জিজ্ঞাসাকে সে মনে স্থান দেন নি-

> "পাদরী সন্ধ্যায় রাত্রে, প্রাতে শিশুপুত্রের সামনেই প্রার্থনা করেন। এখানে বাক্য নেই, শুধু মন স্থির করা ছিল। কখন শিশু মায়ের কোলে শায়িত, কখন কোলে, কখনও স্তন্যপানকালে। এছাড়াক টিলায় টিলায় মধ্যরাত্রে ত প্রার্থনা আছেই।"[২১]

কিন্তু এই গল্পে লেখক উপস্থিত করেছিলেন মানুষের জীবনের সেই চিরকালীন দ্বন্দ্বকে। সমাজ প্রদত্ত ধর্মের পথ নাকি মনুষ্যধর্ম, কোন্‌টি তাঁর পালনীয়? পাদরী সাহেবের আজন্মের ক্রিশ্চান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা নাকি তাঁর 'প্রাণ'(শিশুটি)-এর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা- কাকে তিনি স্থান দেবেন জীবনে? ভামরকে যে সম্মানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত করেছিলেন তার মর্যাদা রানে নি ভামর। পাদরী উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। বুঝেছিলেন যে

ঘটনাকে তিনি মনে করেছিলেন তাঁর ধর্মের পথের পুরস্কার, তা আসলে বয়ে নিয়ে এসেছে চরম অপবিত্রতা, প্রবল অভিশাপের ছায়া,

> "এই বীভৎসতা তিনি আশা করেননি। ...নিজেকে অপদস্থ হতে দেখে, ঠকতে দেখে, অপমানিত হতে দেখে, বুকটা তাঁর ব্যথিত হয়ে উঠল। তাঁর বৃদ্ধ ক্ষমাশীল চোখে জল এল। দেহ নিস্পন্দ, শুধুমাত্র হাওয়ার দড়ি নড়ছে, পিঠে যেন কেউ লাথি মেরে মারুদণ্ডটা ভেঙে দিচ্ছে। রাগ আর লজ্জায় গলা ফুলে উঠল। চোখের জল নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে এসে গির্জ্জাঘরের সামনে বালকের মত কাঁদলেন।"[২২]

এই গল্পে গল্পকার দেখালেন সেই ধর্মপ্রাণ মানুষটির চরিত্রের এক ভিন্ন দিক। সারাজীবনের সঞ্চিত সকল পুণ্যকে নিমেষে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে দেখে 'বেচারী মতিলাল' হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর। যে শিশুকে তিনি প্রভু সম্মানে ভালোবেসে এসেছিলেন তাকেই জীবন থেকে, ধর্মের পথ থেকে, তাঁর উপাসনা-আকাঙ্ক্ষার পথে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, পাদরী মতিলালের হারের গল্পই যেন লিখলেন গল্পকার এখানে। বারবারই জিতে গেলেন মানুষ মতিলাল। ধর্মের বেড়াজালে নিজেকে দীর্ঘদীন বেঁধে রাখা মানুষটিরও বাঁধ ভাঙে। ভালোবাসার কাছে, হৃদয়ের সম্পর্কের কাছে হার মানে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন। মাথা নত করে শুদ্ধতার সংজ্ঞা। ঠিক তাই-ই যেন মনে করিয়ে দিলেন লেখক মতিলালের চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

গভীর জঙ্গলের মাঝে ছেড়ে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর 'প্রাণ'-কে। কিন্তু মানুষ মতিলালের সেই শিশুটির প্রতি তৈরি হওয়া অমোঘ টান তাঁকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

> "পাদরীর আঙরাখার হদিশ না পেয়ে চকিতে শিশু ফিরে তাকালে, চারিদিকে তাকালে, ঠোঁট কেঁপে উঠে 'বা-ও-বা' বলে কেঁদে ফেলল। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অসম্ভব ক্রন্দন- প্রথম দিন এমনি সে কেঁদেছিল।"[২৩]

সেই কান্না উপেক্ষা করতে পারেন নি মতিলাল। আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি ভালোবাসার কাছে। জীবনের এক দীর্ঘ সময় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন সচেতনভাবে যে আদর্শের কথা মাথায় রেখে, সেই আদর্শচ্যুতি তাঁর ঘটল বটে, তবে গল্পের এই শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়ে আমরা দেখতে পেলাম মানুষ মতিলালকে। তাঁর জীবনে এক নববোধের জন্ম হল। সেই ছোট্ট শিশুকে বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে তাই তিনি বলে উঠলেন-

> "আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ্"[২৪]

'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পে এক সৈনিকের জীবনের কথা, তার জীবনের অনুভূতির কথা বলেছেন গল্পকার। যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবন ফৌজ কর্তার সিং-এর। তার জীবনের প্রতিক্ষণ জুড়ে রয়ে যায় বন্দুকের দাঁতঘষা শব্দ, বোমার আওয়াজ, রক্ত, নিষ্ঠুরতা আর ক্রমশ এক অনুভূতিহীন মানুষ হয়ে চলার যাত্রা। কিন্তু এরই মাঝে এক রমনীকে দেখতে পায় করতার সিং, হয়তো বা কল্পনা করে-

> "মেয়েটি উদ্ভিন্নযৌবনা, সুন্দরী অবশ্যই, হাতে রেশমী রুমাল, সুরমাটানা চোখে চিকণ সোনার ফ্রেমের সৌখীন চশমা।"[২৫]

আর সেই রমণী তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক শুদ্ধতার, এক পবিত্রতার আভাস। তার যান্ত্রিক জীবনে যে শুদ্ধতা তাকে কখনও ধরা দেয় নি, সেই অনুভূতিই তার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। সারাজীবন রমণী বলতে করতার জেনেছে,

> "নিদারুণ পাইওরিয়া-ক্ষুব্ধ কর্দ্দমাক্ত গলির দুই পাশে, কভু ক্যানেস্তারার উপর অথবা কাঠের টুলে আসীনা স্ত্রীলোক সকল- পুরাতন গালে ট্যাঙ্কের গুঁড়োর উপর লাল ছোপ দেওয়া যৌবন-চিহ্ন-মাত্র পেটিকোট পরা, বক্ষদ্বয় তুখোড় যেহেতু হাফ-আখড়াই কাঁচুলী কবজায়ে, কোমরে চাবির থোকা আর একদিকে জুট-সিল্কের বাহারী গোলাপী রুমাল।"[২৬]

তবে এই প্রথম কোনো রমণীকে দেখে তার মনে হল রমণীর দেহ সৌষ্ঠব এত স্নিগ্ধতার আভাস দিতে পারে। ফলে এই সৌন্দর্যের অস্তিত্ব তাকে সম্বন্ধহীন করেছিল, অবাস্তব করেছিল। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল যেমন পকেট হাতড়ালেই বন্দুকের গুলি হাতে ঠেকে, তেমনি পাঁজরার পকেটেই হৃদয় নামক যান্ত্রিক বস্তুটি বর্তমান। তবে, হৃদয় নামক যন্ত্রটি যে ঠিক ততটা সহজ নয়, সেই অনুভূতিই তাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। সে বারবার বলতে চেয়েছিল যে সে 'সাধারণ ফৌজের মত বদমায়েশ শয়তান দুশমন'[২৭] নয়। সে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখেছে। উপলব্ধি করেছে ভালোবাসা, স্নেহ,

মমতার মতো অনুভূতিগুলি। শুধুমাত্র বন্দুকের গুলি, প্রতিহিংসা আর জীবন অর্থে যৌনতায় সীমাবদ্ধ পরিসর তার নয়। কিন্তু তারপরেও "আমি ফৌজ সত্যিই।"[২৮]

ব্যাকুল হয়েছিল কর্তার সিং সেই রমণীর কাছে ভালোবাসা চেয়ে। কিন্তু বহু আকুতির পরেও, "রমণী এখনও নিশ্চল"[২৯]। ফলে, বুঝতে বাকি থাকে না যে সেই রমণী কর্তার সিং-এর কল্পনা। দীর্ঘ নীরস জীবনে একজন ফৌজ কল্পনা করেছেন তার না পাওয়া ভালোবাসাকে। আর যেভাবে কর্তার সিং-এর অভিব্যক্তি এই গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন কমলকুমার, তার থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি তাঁর ভাবনার গভীরতা। যে সূক্ষ্মতা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছে ফৌজ কর্তার সিং-এর প্রতিটি অনুভূতি তা আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর রচনায় এক স্বতন্ত্রতার কথা। এমন এক প্রেমের কথা এই গল্পে গল্পকার আমাদের শোনালেন যা শুধু বিষয়গতভাবেই নয়, অনুভূতিগতভাবেও এক সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার দাবি রাখে। যেখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ফৌজ হয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ মনুষ্যত্বহীনতায় ভোগা এক জীবনের কথা, যাদের জীবনে এক দুর্লভ সম্পদের মত হয়ে ওঠে 'আই ল্যভ ইউ'[৩০] নামক শব্দবন্ধ। ফলে যখন সে অনুভব করে ভালোবাসা, উপলব্ধি করে 'অসংখ্য রোমরাজির মধ্যে একটা গোলাপের বিকার'[২৮] তখন যেন ক্রমশ মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করে সে-

> "ফৌজ কর্তারের শরীর পরীর গল্প শ্রবণে অবসন্নতার বদলে মনুষ্যোচিত দিব্য অহংকারে ভরে গিয়েছিল।"[৩১]

'পিঙ্গলাবৎ' গল্পে গল্পকার নির্দেশ করেছিলেন নারী-জীবনের একাকিত্ব, অসহায়তার প্রতি। এই গল্পটির মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যেকোনো সামাজিক অবস্থানেই নারী জীবন অসহায়তার শিকার। একদিকে আঙুরী, আরেকদিকে বিরাজী। আঙুরীর পেশা নাচ দেখিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করা। সকলের দৃষ্টির সামনে নিজেকে মেলে ধরে সে তার জীবন অতিবাহিত করে,

> "হাজার লোকের তৃপ্ত নিশ্বাসের উষ্ণতার মধ্যেও সে নিঃসঙ্কোচে নাচিয়াছে।"[৩২]

আর জীবনে নেমে এসেছে দীর্ঘ রাত। যে রাতের সূচনা হয় শিয়ালের ডাকের সঙ্গে। রাত ছাড়া আঙুরীর কদর কে-ই বা করে? সারারাত নাচের পর এক অদ্ভুত ক্লান্তি গ্রাস করে আঙুরীকে। হাজার হাজার মানুষের পাশবিক চিৎকারে ভরে ওঠে চারপাশ। সে জানতে পারে কত মানুষ, কত ধরনের মানুষ তার নাচ দেখতে আসে,

> "কত লোক ধানের ঠেকা লইয়া গান শুনিতে আসিয়াছে। কোনো লোক শিশি হাতে শুনিতে আসিয়াছে। কবে একজন লোক মড়া ফেলিয়া গান শুনিতে আসিয়াছিল।"[৩৩]

কিন্তু তবুও তার জীবনে অভাব রয়েছে। সে অপেক্ষা করে কারো আসার। যার আগমন তার জীবনে বয়ে আনবে ভালোবাসা। যে ভালোবাসা তার একান্ত কাঙ্ক্ষিত,

> "আঙুরী স্পষ্ট দেখিতে পায় কে যেন আসিয়াছে, চমকাইয়া দরজার দিকে চাহিল। ...দিনের মধ্যে কতবারই যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে! শ্বাসের মধ্যে ইষ্টিশানের গন্ধ পাইয়াছে। কারণ যে আসিবে রেলেই আসিবে। আশায় আশায় আঙুরীর গায়ে গা লাগিয়া যাইতেছে, ...সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।"[৩৪]

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই বিরাজীর মত একটি ক্ষণস্থায়ী চরিত্র। সে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহবধূ। অথচ সেই একই অসহায়তার শিকার সেও। আঙুরী নিজের জীবনে প্রেমের কল্পনা করার সময় নিজের মনেই বলে ওঠে,

> "আমি কি ঘরের বৌ যে চিঠি আসবে।"[৩৫]

অথচ বিরাজী ঘরের বৌ। তারপরেও কি সে চিঠি পায়? পায় না। ফলে সমাজের যেকোনো স্তরেই নারীর এই অসহায়তার চিত্রটি এক। কিন্তু তবুও এক অসম্ভব আশায় বুক বেঁধে জীবনের এই বিশাল সমুদ্দূর পার করে তারা। তাই হয়তো গল্পের শেষে আঙুরীর মধ্যে এক 'বৈদিক রসিকতা'র আভাস দিয়ে যান গল্পকার। আঙুরী "শালগাছ তলায় বালকটিকে দেখিল, তাহার হাতে একটি চিত্রবিচিত্র বাঁশি।"[৩৬] সে নিজেকে নবোঢ়ার মতো এক মায়ায় আবৃত অবস্থায় দেখতে পায়। সে বিশ্বাস করে 'চিঠি আসবেই।'[৩৭]

নারীর এই 'পিঙ্গলাবৎ' জীবনের কথাই লেখক এই গল্পজুড়ে বলেছেন। তার জীবন কখনও পাখির মতোই উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ আবার কখনও খাঁচায় আটকে থেকে অন্যের মনোরঞ্জন। তবে দুই ক্ষেত্রেই সে অসহায়। সে খুঁজে ফেরে আশ্রয়। যে আশ্রয় তাকে দেবে শান্তি, স্বস্তি – দেবে প্রেম।

'জল' গল্পে মানবজীবনের আরেক রূপের ছবি আঁকলেন তিনি। এক বন্যাবিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে মানব জীবনের লড়াইয়ের গল্পকে কেন্দ্র করেই কমলকুমার মজুমদার রচনা করলেন গল্পের প্লট। ফল্পের শুরুতেই তিনি পাঠককে অবগত করেছেন গ্রামবাসীর পরিস্থিতি সম্পর্কে। যেখানে,

> "সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূণ্য;"[৩৮]

চারিদিকে জলমগ্ন এক পরিস্থিতিতে অনিশ্চিত এক জীবন। নোনা জলের উপর অন্ধকার নেমে এসে তাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। অনাহার তো তাদের নিত্যসঙ্গী, সেইসঙ্গে জুড়েছে শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অবক্ষয়, স্বজন হারানোর বেদনা, আরও কত কি। আর এরই মাঝে অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ফতিমার বুক দুরু দুরু করে ওঠে। একরাশ আশঙ্কা বুকে নিয়ে সে নিজের মনেই বলে ওঠে,

> "এ জল কবে সরবে?"[৩৯]

জল সহজে সরে না। কিন্তু জলে বসবাস করতে করতে বদলে যায় মানুষের প্রকৃতি। আর তাই ঘরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত বোন, অসহায় মা ফতিমাকে রেখে ফজল সঙ্গ নেয় নন্দর। কিছু রোজগারের আশায়, দু'মুঠো অন্নের আশায়। কিন্তু যে পথ অবলম্বন করে 'ভাল লোক' ফজল তা অসত্যের পথ, নীতিহীনতার পথ। রাতের অধকারে মাঠের মধ্যে সে আর নন্দ অপেক্ষা করে পথিকের। তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে নিঃস্ব করে হৃত ধনসম্পদের অধিগ্রহণই তাদের উপার্জনের পথ। কিন্তু ফজল পরিস্থিতির শিকার। পরিবারের স্বার্থে, জীবনরক্ষার স্বার্থে সে যোগ দিয়েছে নন্দর সঙ্গে। যা আত্মানুশোচনা দিয়েছে ফজলকে, আত্ম ধিক্কারের জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে। তাই রাতের অন্ধকারে পথিকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ফজল ভাবে,

> "আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুনেনি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।"[৪০]

কখনও কখনও তার মনে অন্য এক চিন্তার উদয় হয়,

> "নন্দকে মারলে হয় না? কেন না খোদাকে ভালবাসত সরলভাবেই নেহাৎ।"[৪১]

কিন্তু ফজলের পক্ষে সম্ভব হয় না সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া। দু'জন অসহায় পথিককে রাতের অন্ধকারে নিঃস্ব করে তাদের সম্পত্তি নিজেদের হস্তগত করে। কিন্তু নন্দ অবাক হয়ে গিয়েছিল পথিকের সামনে ফজলের ব্যবহার দেখে,

> "সে হুড়মুড় করে একেবারে লোকগুলোর সামনে, তার বুকের পাটা হঠাৎ হয়েছিল, তার কাঁধ যেমন ফুলো ফুলো মহিষের কাঁধ যেমন। তার ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল, তার হাত প্রায় লোকটার গলার কাছ দিয়ে তখন ঘুরে গেল সাঁ করে, ফজলের দিকবিদিক ছিল না। সে ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে।"[৪২]

এ এক অদ্ভুত পরিবর্তন। যে ফজল কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভেবেছিল মানুষের সম্পদ হরণ মহা পাপ। খোদার কাছে মুখ দেখানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই ফজলের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক এক বিশেষ দিক্‌নির্দেশ করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন কীভাবে পরিস্থিতি মানুষকে শুধু বাইরে থেকেই নয়, ভেতর থেকেও বদলে দেয়। কীভাবে 'ভাল লোক' ফজল হয়ে ওঠে হিংস্র, নিষ্ঠুর। 'তিনদিন তিনরাত উপোসী'[৪৩] থেকে নন্দ এবং ফজল দুজনেই হয়ে উঠেছিল এক অন্য মানুষ। তবে আদ্যন্ত গল্পের কাহিনি থেকে আমরা বুঝতে পারি, নন্দর থেকেও বেশি পরিবর্তন এসেছিল ফজলের জীবনে। তার জীবন ধারণের পথ এবং পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার। চ্যুতি ঘটেছিল তার। আত্মসম্মান, নীতিবোধ, সামাজিক অবস্থান – সবকিছুকে জলাঞ্জলী দিয়ে জীবনধারণের জন্য, শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিল ফজল, তা-ই তার জীবনের অন্তিম পরিণামের উৎসস্বরূপ।

তবে ফজলের জীবনের এই গল্পেও আমরা পাই এক ভালোবাসার চিত্র। ফসল ভালোবেসেছিল নিজের সততা, নিজের নীতি। নিজেকে ভালোমানুষ বলে চিহ্নিত করতে তাই কখনও তার দ্বিধা বোধ হয় নি। কিন্তু পরিস্থিতির তাড়নায় পরিবর্তিত ফজল যেন পরবর্তীতে নিজেকেই আর ভালোবেসে উঠতে পারে নি। এই নিষ্ঠুর, দয়া-মায়া হীন ফজলকে নিজেই ভালোবেসে উঠতে পারে নি সে। আর এই পরিবর্তন, তরহা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই হয়ে উঠেছে গল্পের অন্তিমে তার আত্মহননের একটি বিশেষ কারণ।

> "শব্দহীন কান্না নিমের থেকেও তিক্ত, শাপের থেকেও ভয়ঙ্কর।"[৪৪]

'তাহাদের কথা' গল্পে শিবনাথের জীবনগাথা খানিকটা সেই শব্দহীন কান্নারই অনুরণন বোধ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথ, এম.এ পাশ শিবনাথ, স্বামী শিবনাথ, পিতা শিবনাথ – কিন্তু তার এই সকল সত্তার উপরে গল্পে উঠে আসে এক মানসিক ভারসাম্যহীন শিবনাথের কাহিনি। স্বপ্নভঙ্গের গ্লানি শিবনাথকে উপনীত করেছে এই পর্যায়ে। তার এই পরিবর্তন তার সংসারেও এনেছে নানা বিপর্যয়। শিবনাথের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী নতুন করে আবার সব সাজিয়ে তুলতে চেয়েছে। তবে হেমাঙ্গিনী এও জানতো যে শিবনাথের দ্বারা তা সম্ভব নয়। ফলে শিবনাথের পায়ে তুলে দেওয়া হয়েছে শিকল। অন্নপূর্ণা (শিবনাথের মেয়ে)-কে টাকার লোভে ডেপুটীর মনোরঞ্জন করতে পাঠিয়েছে হেমাঙ্গিনী। কিন্তু জ্যোতি (শিবনাথের ছেলে) গল্পে একটী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তার নামের সঙ্গে মিশে গেছে গল্পে তার উপস্থিতির অর্থ। মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে চাওয়া শিবনাথের পায়েই যখন উঠে এসেছে শৃঙ্খল, তখন জ্যোতিকে দিয়েই ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনেন কমলকুমার। মা, দিদি, বিন্দু পিসিমা সবার বিপক্ষে একা জ্যোতি লড়ে যায় তার বাবার মুক্তিযুদ্ধ,

> "অন্নপূর্ণা এখন তালা লাগাল, শব্দ হল, 'হাঃ' করে নিশ্বাস ফেলে শিবনাথের দেহ ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, তখনই জ্যোতি 'বাবা' বলে লাফ দিয়ে উঠল। অন্নপূর্ণাকে ধ্যাঁকরে একটা ঘুষি মারতেই তার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বাবা'।"[৪৫]

শিবনাথ ভারতের সেই ব্যর্থ স্বাধীনতা, যে এসেও আসেনি। অর্থাৎ, শুধু অধিকার বদল হয়েছে। দেশজননী আজীবন কারারুদ্ধই। আর যারা এই ব্যর্থ সংগ্রামের জন্য জীবনপাত করেছে, বিসর্জন দিয়েছে সেই সবকিছু যা নিজের একান্ত আপন – তাদের সকলের প্রতিচ্ছবি হয়ে জন্ম নিয়েছে শিবনাথ চরিত্রটি। যাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন 'লৌহের শৈত্য'[৪৬]-এ ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে পড়ছে। কিন্তু তবুও কমলকুমার গল্পের শেষে নায়ক করে রাখলেন জ্যোতিকে। বাবার প্রতি তার আনুগত্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ পাঠকের দৃষ্টিতে তাকে এক ঔজ্জ্বল্য প্রদানে সক্ষম হয়। আর সেইসঙ্গে আবারও কমলকুমার ফুটিয়ে তুললেন এক পিতা-পুত্রের সম্পর্কের, ভালোবাসার অমলিন ছবি। শিবনাথের দেশের প্রতি ভালোবাসা যেমন নিষ্কলুষভাবে ফুটে উঠেছে গল্পটির মধ্য দিয়ে, তেমনি সেই ভালোবাসার প্রত্যাঘাতে মানসিক ভারসাম্যহীন শিবনাথের কথাই যেন বেশি করে বলেছেন গল্পকার।

ফলে কমলকুমার মজুমদারের গল্পগুলিতে প্রেমসম্পর্কের যে বিচিত্র দিকগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে, তা পাঠকমনে এক ভিন্নতার আভাস দিতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী মানুষের জীবনে প্রেমের বা ভালোবাসার উপস্থিতিকে তিনি মানুষের মনোস্তত্ত্বের সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধেছেন। যেহেতু "কমলকুমারের সমস্ত রচনার উপাদান দেশজ এবং মূলত গ্রামভিত্তিক"[৪৭] আর সেই পথেই এগিয়ে চলেছে তাঁর গল্পের চরিত্ররা।

তথ্যসূত্র :

১. দত্ত বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খন্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৮৫, নবম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৬১০

২. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, নবম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২১, পৃ. ৪৬

৩. গঙ্গোপাধ্যায় হিরণ্ময়, 'কমলকুমার মজুমদার জীবন ও সাহিত্য', Liber Fieri, C/o Debnath House, Kabi Sukanta Road, Nabapally, Barasat, Kolkata – 700126, পৃ. ১২৫

৪. মজুমদার কমলকুমার, 'গল্প সমগ্র', 'লাল জুতো', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়া টোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮, পৃ. ১৮

৫. তদেব, পৃ. ১৮

৬. তদেব, পৃ. ২০

৭. তদেব, পৃ. ২২

৮. তদেব, 'মধু', পৃ. ২৩

৯. তদেব, পৃ. ৩১
১০. তদেব, 'মল্লিকা বাহার', পৃ. ৫৮
১১. তদেব, পৃ. ৫৯
১২. তদেব, পৃ. ৬২
১৩. তদেব, পৃ. ৬৩
১৪. তদেব, পৃ. ৬৪
১৫. তদেব, পৃ. ৬৪
১৬. তদেব, পৃ. ৬৫
১৭. তদেব, 'মতিলাল পাদরী', পৃ. ৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ৬৭
১৯. তদেব, পৃ. ৬৮
২০. তদেব, পৃ. ৭০
২১. তদেব, পৃ. ৭৮
২২. তদেব, পৃ. ৮০
২৩. তদেব, পৃ. ৮২
২৪. তদেব, পৃ. ৮৩
২৫. তদেব, 'ফৌজ-ই-বন্দুক', পৃ. ১০৭
২৬. তদেব, পৃ. ১১১
২৭. তদেব, পৃ. ১১৩
২৮. তদেব, পৃ. ১১৩
২৯. তদেব, পৃ. ১১৪
৩০. তদেব, পৃ. ১১৩
৩১. তদেব, পৃ. ১১৪
৩২. তদেব, 'পিঙ্গলাবৎ', পৃ. ২৬৩
৩৩. তদেব, পৃ. ২৬৪
৩৪. তদেব, পৃ. ২৬৩
৩৫. তদেব, পৃ. ২৬৪
৩৬. তদেব, পৃ. ২৬৪
৩৭. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩৮. তদেব, 'জল', পৃ. ৩২
৩৯. তদেব, পৃ. ৩২
৪০. তদেব, পৃ. ৩৫
৪১. তদেব, পৃ. ৩৫
৪২. তদেব, পৃ. ৩৫
৪৩. তদেব, পৃ. ৩৭
৪৪. তদেব, 'তাহাদের কথা', পৃ. ৮৫
৪৫. তদেব, পৃ. ১০৩
৪৬. তদেব, পৃ. ১০৩

৪৭. মজুমদার কমলকুমার, 'উপন্যাস সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০০২, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৯, পৃ. ২

গ্রন্থপঞ্জি :

১. গঙ্গোপাধ্যায় হিরণ্ময় : 'কমলকুমার মজুমদার জীবন ও সাহিত্য', Liber Fieri, C/o Debnath House, Kabi Sukanta Road, Nabapally, Barasat, Kolkata – 700126

২. দত্ত বীরেন্দ্র : 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খন্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেণিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৮৫, নবম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১

৩. মজুমদার কমলকুমার : 'উপন্যাস সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ – জানুয়ারি ২০০২, সপ্তম মুদ্রণ – ২০১৯

৪. মজুমদার কমলকুমার : 'গল্প সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে সুবীর কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে মুদ্রিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, একাদশ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮

৫. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ : 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১, নবম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২১